The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 263-281, ISSN 2306-3920

পূর্ব বাংলায় শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবতা : ১৯৪৭-৭১

নাসিমা হামিদ*

[**সার-সংক্ষেপ:** শ্রমক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের পারস্পারিক সম্পর্ক, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রণীত হয় শ্রম আইন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে পূর্ব বাংলায় বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহ যেমন-'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট', 'দ্য ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট', 'দ্য ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট', 'দ্য ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেশান অ্যাক্ট','দ্য পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট' প্রভৃতি আইনের শর্তসমূহ যথাযথভাবে শিল্পকারখানাগুলোতে প্রয়োগ করা হয়নি। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার বহিরাগত অবাঙালি মালিকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষণ করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণির উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ আইন আরোপ করে যা ছিল শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থি। ফলে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমগ্র পাকিস্তান আমলে তাই শ্রমিকের নিম্ন মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, শ্রমিক ছাঁটাই, কাজের অনুন্নত পরিবেশ, বোনাস প্রভৃতি সংকটের সমাধান হয়নি। ফলে এ সময় শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয় এবং অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করা এবং শ্রমিক আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব প্রদান করেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। ফলে আন্দোলন জোরদার হয় এবং ক্রমে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে পূর্ব বাংলায় শ্রম আইন ব্যবস্থা থাকার পরেও কেন পূর্ব বাংলায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং কীভাবে শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে তা অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।]

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শ্রম আইনই কার্যকর থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশরা প্রথম শ্রম আইন করেছিল। এ আইন প্রণয়নের পূর্বে শ্রমিকের মজুরি, কর্মঘন্টা, কাজের পরিবেশ, বোনাস ইত্যাদি নির্ধারণ করতো মালিকপক্ষ। এতে শ্রমিক শ্রেণি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ব্রিটিশ শ্রম আইন প্রবর্তিত হলে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয় শ্রমিক স্বার্থ। শ্রম আইনকে শ্রমিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। অধিকাংশ কারখানার মালিক শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন ও শোষণ চালায়। এরূপ বাস্তবতা পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত থাকে। লক্ষ করা যায় ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার যে শ্রমনীতি ঘোষণা করে তার মূল কথা ছিল পাকিস্তানে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা যাতে শ্রমিকরা যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে পারে (Ahmad, 1969 : 73-74)। কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটেনি। ১৯৫৮

* **মোছা. নাসিমা হামিদ :** সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সালের নূর খান ঘোষিত শ্রমনীতির প্রশ্নেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। কারণ এতে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার আই. এল. ও.[১] কনভেনশনের মূলনীতি অনুযায়ী শ্রমিকের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার প্রভৃতি অধিকারসমূহ রক্ষা করবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, এসময় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর স্বাভাবিক কর্মসূচি পালন, এমনকি তাদের অফিসসমূহ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে (Umar, 2006 : 38-39)। অনেক শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস বন্ধ এবং সিলগালা করে দেওয়া হয়। এমনকি এর সকল নথিপত্র এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে 'আই. এল. ও' এর ৮৭ নং কনভেশনের 'সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সংগঠিত করার অধিকার রক্ষা' সংক্রান্ত ধারাটি স্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়। এমনকি এ সময় পূর্ব বাংলার শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার হরণ করা হয়। এরূপ চিত্র পশ্চিম পাকিস্তানেও বিরাজমান ছিল। ফলে পাকিস্তান সরকারের এ নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং তারা ন্যায্য মজুরি, শোষণমূলক মালিকানা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে দ্রুত সংগঠিত হয় জোরদার শ্রমিক আন্দোলন, যে আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামকেও জোরদার করেছিল বিপুলভাবে। জোরদার এই শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনায় শ্রম আইনের প্রশ্ন যুক্ত থাকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা রয়েছে। এছাড়াও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত কোনো আলোচনা-গবেষণা না থাকায় এ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান। দুটি গবেষণা প্রশ্নকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। প্রথমত, শ্রমআইন ব্যবস্থা থাকার পরেও কেন পূর্ব বাংলায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং জোরদার শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম নেয়? দ্বিতীয়ত, কীভাবে শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অংশভাগী হয়ে পড়ে?

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যসংগ্রহ

বর্তমান গবেষণার জন্য ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য উপাত্তের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল আরকাইভ্স এ সংরক্ষিত দলিলপত্র, পত্রিকা, সেন্সাস রিপোর্ট, জেলা গেজেটিয়ার এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত হেরিটেজ আরকাইভ্স এ সংরক্ষিত দলিলপত্র, জীবনী গ্রন্থ, স্মৃতিকথা, পত্র-পত্রিকা, ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এ সম্পর্কিত প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনার সহায়তা নেয়া হয়। তথ্য সংগ্রহের পর যাচাই-বাছাই ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে রচনা করা হয় বর্তমান প্রবন্ধ। আলোচনার সুবিধার্থে শুরুতেই শ্রম আইনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে।

শ্রম আইন

শ্রম আইন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই যে প্রশ্নটি বিবেচ্য তা হলো শ্রম আইন কী? সাধারণত শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্পর্ক ও এই সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় যে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই শ্রম আইন। শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিকের মজুরি, কাজের পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয় এ আইনের অংশ। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মাতৃত্ব সুবিধা, কোম্পানির মুনাফাতে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব এবং এধরনের অন্যান্য বিষয় পরিচালনার সামাজিক আইনও শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত। এসব আইনি দলিলপত্রের অধিকাংশই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করে (https://en.banglapedia.org/index.php?title=Labour_Law)। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার, মালিক-শ্রমিকের পারস্পারিক সম্পর্ক ইত্যাদি এ আইনের আওতাধীন (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/labor-law)।

সহজভাবে বলা যায়, মালিক-শ্রমিক উভয়ের যথোপযুক্ত প্রয়োজনের অনুমোদন এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রণীত রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিই হলো শ্রম আইন। এই আইন প্রণয়নের ফলে শিল্পক্ষেত্রে মালিক–শ্রমিকদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

পূর্ব বাংলায় প্রণীত শ্রম আইনসমূহ

পূর্ব বাংলায় শ্রম আইনের উৎপত্তি হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে (Khan (edi), 1996 : 25)। এসময় ব্রিটিশ বণিকরা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে স্বল্প মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করে স্থানীয় সস্তা শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশি দামে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করেছে। মূলত ১৮১৩ সালে কলকাতায় কটন মিল এবং ১৮৫৩ সালে রেল লাইন নির্মাণের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে (Yushuhong and Malik-zia-uddin, 2017, Article, https://www.researchgate.net/publication/321874146)। এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংহত করতে বেশ কিছু শক্তিশালী আইন প্রবর্তন করে। ইংল্যান্ডের জন্য এ দেশে একটি 'সুরক্ষিত এবং বন্ডেড' শ্রম বাজার তৈরি করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে উপযোগী শিল্প আইনও প্রবর্তন করা হয়। ভারত সরকার এসময় ব্রিটিশ পণ্য ভারতে আসার সব রকম নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। ফলে বৃটেনের যন্ত্র উৎপাদিত উন্নত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তশিল্প টিকতে পারে না। এমনকি এসময় ভারত সরকার ভারতে ব্রিটিশ পণ্য ক্রয়কারী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এবং অনেক ব্রিটিশ কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীরা ভূমি রাজস্ব কমানোর উদ্যোগ নেয়- যাতে করে ভারতীয় কৃষকরাও বিদেশি পণ্য ক্রয় করে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে বৃটেনে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে উচ্চ শুল্ক ধার্য করা হয়। ব্রিটিশদের এই বাণিজ্য নীতি ভারতীয়দের বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংস করে (Chandra, 2009 : 96)। ফলে এসকল শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকরাও অমানবিক শোষণের শিকার হয়েছিল। রাষ্ট্রের তদারকি এবং শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতির কারণে মালিক শ্রেণি শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করিয়ে নিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ (Khan (edi), 1996 : 25)। ফলে ভারতে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। ভারতের প্রথম ফলপ্রসূ শ্রম আইন 'ভারতীয় কারখানা আইন' বা 'দ্য ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরিস' অ্যাক্ট' ১৮৮১ সালে প্রণীত হয়। তবে এ আইন মূলত এদেশে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে (Shaheed, 2007 : 67)। এই আইন ১৮৯১, ১৯১১ এবং ১৯২২ সালে আংশিক সংশোধিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করা হয় (Khan (edi), 1996 : 25)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেগবান হয়। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের উন্নত পরিবেশের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও.) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্বীকৃতি প্রদান করে (খান, ২০১৩ : ৩১৫)। এর পূর্বে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের ভালো কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বঞ্চনাবোধ তৈরি হয়। তবুও আই.এল.ও. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিক ইউনিয়নগুলো 'দ্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-১৮৬০ এর ১২০ নং ধারা[২] এবং 'দ্য ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ১৮৭২' এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়াস চালায়। এই আন্দোলন উপমহাদেশে পোর্ট ট্রাস্ট, রেলওয়ে এবং পোস্ট অফিস ইত্যাদি সেক্টরে শ্রমিক ইউনিয়ন

গঠনে অনুপ্রেরণা জোগায়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালে 'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট' এবং ১৯২৯ সালে 'দ্য ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করে (Ahmad, 1969 : 13)।

১৯২৬ সালের 'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট'- এ শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন, রেজিস্ট্রেশন এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার বৈধতা প্রদান করে। অন্যদিকে ১৯২৯ সালের 'দ্য ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট'-এ ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতা করার অধিকার প্রদান করে (Yushuhong and Malik-zia-uddin, 2017, Article, https://www.researchgate.net/publication/321874146)। ট্রেড ইউনিয়ন কোনো সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে তা পুনরায় তদন্ত ও মধ্যস্থতা করার জন্য আদালতে প্রদান করা হবে বলে স্বীকৃত হয়। পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু আইন যেমন মজুরি পরিশোধ আইন, ১৯৩৬; খনি আইন, ১৯২৩; শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩; ডক শ্রমিক আইন, ১৯৩৪ প্রণয়ন করা হয়। যে আইনগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র শিল্পক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের জন্য সংবিধিবদ্ধ শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেয়।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে শ্রম আইনগুলো প্রণীত হয়েছিল পাকিস্তান সরকার সেগুলোই গ্রহণ করে। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে মাত্র ৩.৬% শিল্পকারখানা, ২.৬% শিল্প শ্রমিক এবং ভারত ও পাকিস্তানের মোট শিল্প কর্মসংস্থানের ৭.৩% পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল (Akhtar, 1951 : 263-264)। শ্রম আইনগুলো এসময় নিম্নোক্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োগ করা হয়-(i) পাঁচ বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে যে কারখানায় যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় (ii) খনি শিল্প (iii) রেলওয়ে (iv) দোকান ও বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠান (v) অভ্যন্তরীণ স্টীমার (vi) সমুদ্রগামী জাহাজ (vii) ডক ও বন্দরে নিয়োজিত শ্রমিক (viii) চা বাগান শ্রমিক (ধর, ২০১৭ : ১৬৩)।

১৯২৩ সালে 'দ্য ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেশান অ্যাক্ট' বা 'শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন' প্রণীত হয়। এ আইনে বলা হয়-যারা প্রশাসনিক বা করণিক কাজে নিযুক্ত বা যাদের মাসিক মজুরি ৫০০ টাকার বেশি তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য ১৯২৩ সালের 'শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন' প্রযোজ্য। কাজের সময় দূর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং ৪ দিন অক্ষম থাকলে নিয়োগকারী বা মালিক অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তবে কেউ নিরাপত্তা আইন অবজ্ঞা করলে বা সুরক্ষা সরঞ্জামগুলি ব্যবহারে ব্যর্থ হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে না। কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে কিংবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তার মাসিক মজুরির উপর নির্ভর করে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি থোক অর্থ প্রদান করবে। কেউ স্থায়ীভাবে আংশিক অক্ষম হলে স্থায়ীভাবে অক্ষমতার জন্য প্রদানকৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে প্রদান করবে এবং অস্থায়ীভাবে অক্ষমতার জন্য শ্রমিককে তার মাসিক মজুরির অর্ধেক ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। এই আইনের অধীনে কোনো শ্রমিক যদি পেশাগত কারণে কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তাকেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে (Ahmad, 1969 : 71)।

১৯২৬ সালের 'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট' এ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ঐচ্ছিক করা হয় এবং রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সাত বা ততোধিক সদস্য বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপযোগী ছিল। নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের জন্য নীতিমালা ছিল– ইউনিয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সদস্য অন্তর্ভূক্তি, অফিস কর্মকর্তা নিয়োগ, আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি। এই ইউনিয়নগুলোতে বাইরে থেকে ৫০% এর বেশি কর্মকর্তা থাকবে না। ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই আইন নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং তাদের সদস্যদের নির্দিষ্ট দেওয়ানি মামলা এবং ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে। এই আইন ১৯৬০ সালে সংশোধিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৫ সালে এ সংক্রান্ত

নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় (Labour and Industries Department, Government of East Pakistan Press : 1960)। এই নতুন আইনের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন কিংবা অনুমোদনের ব্যাপারে মালিক কিংবা শ্রমিকের কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা হতো না। তাদের পরিবর্তে প্রাদেশিক শ্রম পরিচালককে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আই.এল.ও'র ৮৭ এবং ৯৮ নং কনভেনশন লঙ্ঘন করা হয়।

১৯৩৬ সালের 'দ্য পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট' বা 'মজুরি পরিশোধ আইনে' বলা হয়- কারখানা ও রেলওয়েতে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে মজুরি মেয়াদ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে হবে। অযৌক্তিকভাবে মজুরি কর্তন না করে শ্রমিককে দ্রুত তার মজুরি প্রদান করতে হবে। তবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মজুরি কর্তনে অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন– জরিমানা, আবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি (Ahmad, 1969 : 70)।

১৯৩৯ সালে বাংলায় প্রণীত 'দ্য ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট' বা 'মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন'-এ কারখানায় নিযুক্ত করণিক, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের জন্য শিশু জন্মের পূর্বে ছয় সপ্তাহ এবং পরে ছয় সপ্তাহ ছুটি নির্ধারিত করা হয়। পূর্ব বাংলা মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন ১৯৫০ সালে চা কারখানা এবং চা বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্যও প্রয়োগ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী নিয়োগকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন বেতন ও সুবিধাদি দিতে বাধ্য ছিল (ধর, ২০১৭ : ৮৮-৮৯)।

১৯৪৭ সালে প্রণীত 'দ্য ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট' বা 'শিল্প বিরোধ আইন' যে কোনো শিল্প বিরোধের তদন্ত, নিষ্পত্তি এবং বিচারকার্য পরিচালনা করে। সরকার বিদ্যমান বিরোধের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে রিপোর্টের জন্য আদালতে বা বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সমঝোতা বোর্ডের কাছে বা বিচারের জন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালের কাছে পাঠাতে পারে। ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক করা হয় এক বছর বা তার কম সময়। এই আইনে পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসে বিরোধের ক্ষেত্রে সমঝোতা বাধ্যতামূলক এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক করা হয়। চৌদ্দ দিনের নোটিশ ছাড়া পাবলিক ইউটিলিটি পরিষেবাগুলোতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল এবং সমঝোতাকালীন এবং বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন কিংবা মীমাংসা নিষ্পত্তিকালীন ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় (Ahmad, 1969 : 72)।

এই আইনটি ১৯৫৯ সালে বাতিল করা হয় এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৯৫৯ সালে 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সও ১৯৬৫ সালে বাতিল করে ১৯৬৫ সালে 'দ্য ইস্ট পাকিস্তান লেবার ডিসপিউটস অ্যাক্ট-১৯৬৫' প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এই আইনটি ধীর গতিতে বিকশিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম ত্রিপক্ষীয় শ্রমিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন ,

> সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা এবং নিশ্চিতভাবে শিল্পের বিকাশ শ্রমিকদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। যা শ্রমিকদের সন্তুষ্টি এবং উন্নতির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। আমাদের নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শ্রমিকরা যাতে সমস্ত উদ্যোগে প্রাপ্য অংশ পায় সে বিষয়ে আমার সরকার সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শ্রমিকদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির স্বার্থের চেয়ে পাকিস্তানের স্বার্থ ও কল্যাণ উর্ধ্বে এবং পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকারক হয় এমন কিছু করা উচিত নয়। যদি পাকিস্তানের উন্নতি হয় তাহলে শ্রমিক সমস্যারও সমাধান হবে। (Ahmad, 1969 : 72-73)

১৯৫৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় শ্রমিক সমাবেশের পঞ্চম অধিবেশনে, শ্রম মন্ত্রী ড. এ এম. মালিক বলেন,

> গত কয়েক বছর ধরে একটি সমন্বিত শ্রমনীতি প্রণয়নের প্রশ্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরকারের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত না থাকায় একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা বাস্তবায়িত হয় নি। তাই শ্রমিক সমস্যা ও তাদের অবস্থার উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সাধারণ জরিপ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে শ্রমক্ষেত্রে কী ধরণের আইন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ তা খুঁজে বের করা যায়। (Ahmad, 1969 : 73)

১৯৫৫ সালের ১৫ আগস্ট, ড. এ. এম. মালিক করাচিতে একটি সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের নতুন শ্রমনীতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্য সমন্বিত শ্রমনীতি হিসেবে পরিচিত।এই শ্রমনীতির বিশেষত্ব হলো -

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অর্থাৎ আই. এল. ও.র ৯৮ নং কনভেনশন মোতাবেক সমষ্টিগত দরকষাকষিকে উৎসাহিত করতে হবে।

২. মালিক ও শ্রমিক উভয় ক্ষেত্রেই অবাঞ্চিত কাজের জন্য শ্রম মন্ত্রী একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

৩. মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য সাধন করতে পারবে না।

৪. একটি আইন সংস্থা গঠন করতে হবে যাতে প্রয়োজনে ট্রেড উন্নয়ন গুলোকে অনুমোদন করা যায়। এজন্য ১৯২৬ সালের আইনটি সংশোধন করতে হবে।

৫. খাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য কারও ধরপাকড় করা যাবে না।

৬. ইউনিয়ন কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত বহিরাগত প্রতিনিধিদের সংখ্যা শতকরা ৫০ হতে কমিয়ে শতকরা ২৫ করতে কিন্তু এই নীতিমালা সরকারের যে বিভাগের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল তারা মেনে না নেওয়ায় এই শ্রমনীতি প্রয়োগ হয়নি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতে– মুসলিম লীগ সরকার শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করার জন্যই এ শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছে। (হোসেন, ২০০২ : ৫২)

আমরা লক্ষ্য করি, যদি কোনো দেশ আই.এল.ও. কনভেনশন অনুমোদন দেয় তাহলে সে দেশ আই.এল.ও.'র নীতিমালা প্রয়োগ করতে বাধ্য। আই.এল.ও. কনভেনশনের ১০০টির বেশি (পাকিস্তান আমলে) কনভেনশনের মধ্যে পাকিস্তান অনুমোদন করে ২৩টি। তার মধ্যে ১৫টি কনভেনশন দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর পাকিস্তান আই.এল.ও. তে যোগদানের পর থেকে সেগুলোই মেনে চলেছে (ধর, ২০১৭ : ৭৭৬-৭৮৬)। এই কনভেনশনগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের অনুমোদিত ৮৭নং এবং ৯৮নং কনভেনশন দু'টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৩] কারণ এখানে শ্রমিকদের সংগঠিত করার অধিকার এবং যৌথভাবে দর কষাকষির অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে, যদি এই দু'টি কনভেনশন সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করা হত বা অনুসরণ করা হয় তাহলে সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়নিজম নিশ্চিত করার জন্য আর কোনো শ্রম আইনের প্রয়োজন হতো না (Ahmad, 1969 : 74)। ১৯৫৭ সালের ২৩ মে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড এর মিটিং–এ পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> প্রকৃতপক্ষে নিয়োগকারী এবং কর্মচারী বা শ্রমিক উভয় পক্ষের নেতাদের নিরঙ্কুশ সাহায্য-সহযোগিতা এবং পরামর্শ ছাড়া সরকারি শ্রমনীতি শতভাগ কার্যকরভাবে প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্ভব নয়। (Ahmad, 1969 : 75)

সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডব্লিউ. বার্কি করাচীতে পাকিস্তানের জন্য ১১ দফা শ্রমনীতি ঘোষণা করেন (খান, ২০১৩ : ৪০৬)। সেখানে বলা হয়-

১. পাকিস্তান কর্তৃক অনুমোদিত আই. এল. ও. কনভেনশন রিকমেন্ডেশনের ভিত্তিতে শ্রমক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

২. স্থিতিশীল সামাজিক কাঠামো, শিল্পের শক্তি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ সরকার আশা করে। মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে সরকার মনে করে।

৩. অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য শিল্প শক্তি অপরিহার্য। যৌথ আলোচনা, স্বেচ্ছামূলক আরবিট্রেশন, সালিসি, মধ্যস্থতা, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি আইনসংগত উপায়ে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যকার শিল্প-বিরোধ নিরসন সম্ভব বলে সরকার মনে করে।

৪. উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকদের সামাজিক সুবিধাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, বাসস্থান, মজুরি এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। বেকারত্ব দূরীকরণে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। রাষ্ট্র ফি-বিহীন চাকরির নিয়োগ এজেন্সি চালু রাখবে এবং নিয়োগ তথ্যাদির কর্মসূচির উপর কাজ করবে।

৫. শ্রমিকদের কাজ ও পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ সম্পর্কে বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহ প্রদান করে।

৬. সরকার বিশ্বাস করে সমাজকর্ম কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়। সমাজকল্যাণমূলক সুবিধাদি প্রদানে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠনসমূহেরও উচিত যৌথভাবে তাদের সম্পদ কাজে লাগানো। তাই সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের নিকট পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে সরকার আন্তরিক।

দেশে এবং বিদেশে নাবিকদের যথোপযুক্ত চাকরির নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে। সরকার শ্রম ও নিয়োগক্ষেত্রে বন্ধু দেশসমূহের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়। উল্লেখ্য যে, এ শ্রম আইন তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত এবং কিছু কিছু সামরিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো। দ্বন্দ্বের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ক্ষেত্রটি ছিল–'শ্রমক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের নীতি আই.এল.ও. কনভেনশন এবং পাকিস্তান কর্তৃক অনুমোদিত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৯ সালে সামরিক আইন প্রশাসন শিল্প বিরোধ আইন (দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্ট) বাতিল করে এবং এ বছরই 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ প্রবর্তন করে (Ahmad, 1969 : 78-79)। এই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. মালিকপক্ষ ও কর্মচারী বা শ্রমিকদের মধ্য থেকে উভয়ের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সভাপতি এবং দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে স্থায়ী শিল্প আদালত স্থাপন করবে। শিল্প আদালত সামরিক আদালত হিসেবে বসবে এবং সামরিক নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

২. এ অধ্যাদেশে সমঝোতাকারী কর্মকর্তাকে যে কোন শিল্প বিরোধ মীমাংসা করার জন্য পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসে ১৪ দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য মামলায় ২৮ দিনের মধ্যে সমাধান প্রদান করতে হবে। কর্মকর্তা ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার সনদপত্র প্রদান সাপেক্ষে যে কোনো পক্ষই বিরোধের বিচারের জন্য সরাসরি শিল্প আদালতে যেতে পারবে।

৩. মালিক এবং কর্মচারী বা শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কেউ সমঝোতা প্রক্রিয়া চলাকালীন চুক্তির যে কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'মীমাংসা'র সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা হয়।

১৯৬১ সালে 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অর্ডিন্যান্স' সংশোধন করা হয় (Ahmad, 1969 : 79-80)। সংশোধিত আইনের প্রধান শর্তগুলো হলো–

১. এ অধ্যাদেশে যে কোনো বিরোধ অর্থহীন এবং হয়রানিমূলক কিনা তা নির্ধারণ করার এবং আবেদন খারিজ করার ক্ষমতা পায় শিল্প আদালত।
২. শিল্প আদালত আপিলের উদ্দেশ্যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে দায়রা আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং আপিল উচ্চ আদালতে যাবে।
৩. ১৯৫৯ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নিয়োগকারী (মালিক) শিল্প আদালতে সমঝোতা প্রক্রিয়া স্থগিত থাকাকালীন সমঝোতা কর্মকর্তা বা শিল্প আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোনো শ্রমিক ছাঁটাই, বরখাস্ত বা শাস্তি দিতে পারবেনা।

১৯৬৫ সালে ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন সংশোধন করে নতুন কারখানা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে মোট ১১৬টি ধারা ও ১টি তফসিল রয়েছে। এই আইনে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও স্যানিটারী, বেতনসহ ১০ দিনের উৎসব ছুটি, বেতনসহ ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত কারণে গড়ে অর্ধেক বেতনে ১৪ দিনের ছুটি প্রদানের কথা বলা হয় (কুন্ডু, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ:৭৬-৮৩)। নীতিসমূহ অসন্তোষজনক ছিলো না কিন্তু সরকারের নিয়মিত তদারকির অভাবে কারখানাগুলোতে তা খুব কমই প্রয়োগ হয়েছে।

ষাটের দশকে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। কারণ এসময় শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় নীতিমালা গ্রহণ করা হলেও মালিক শ্রেণি তা অনুসরণ করেনি। তাদের সর্বনিম্ন মজুরী কম ধার্য করা হয়েছিল। অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছিল (দৈনিক সংবাদ : ২৯ মার্চ, ১৯৭০)। ফলে তাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ সময়ই ঋণ নিতে হত। অনেক সময় শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে চলে গেলে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা হত না। ফলে শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বেড়ে যায়। এছাড়া কারখানাগুলোর শ্রমিকরা অসুস্থ হলে তার জন্য কোনো চিকিৎসা কিংবা ন্যায্য ক্ষতিপূরণও পেত না। এসবকারণে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৯৬৯ সালে ঘেরাও আন্দোলনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, চট্রগ্রাম, খুলনার শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং শ্রমিক নেতা ও মালিকদের সাথে সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় এয়ার মার্শাল নূর খান (ডেপুটি চিফ, মার্শাল ল') পূর্ব বাংলার ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা নিম্নোক্ত দাবি-দাওয়াগুলো উত্থাপন করে -

(ক) ১৯৬৫ সালে প্রনীত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইনসমূহ বাতিল করতে হবে।
(খ) যে কোনো বিরোধের মীমাংসা বা মামলার নিষ্পত্তিতে অহেতুক বিলম্ব পরিহার করতে হবে।
(গ) শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক স্থাপিত যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা ও দুর্বলতা দূর করতে হবে। (Ahmad, 1969 : 105)

১৯৬৯ সালের ১১ এপ্রিল এয়ার মার্শাল নূর খান মালিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জুন এয়ার মার্শাল নূর খান শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে স্থানীয় শ্রমিক সমস্যাবলী নিয়ে

আলোচনা করেন। তার ভাষ্যমতে, দেশের উৎপাদন হার বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদের অধিকতর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বর্তমানে এদেশে উৎপাদনের হার খুবই স্বল্প। ১৯৬৯ সালের প্রস্তাবিত শ্রম আইন সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। মালিকদের পক্ষ থেকে যুক্তি ছিল যে, মজুরি বৃদ্ধি করলে বিনিয়োগ কম হবে এবং কর্মসংস্থানও কম হবে। দাম বৃদ্ধির কারণে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মূল্যস্ফীতি ঘটবে এবং অদক্ষ ও অসংগঠিত ভূমিহীন শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেয়ে জঙ্গীবাদে রূপ নেবে এবং সেই সাথে তাদের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা তেরি হবে। নূর খান বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থের সাথে মালিকদের স্বার্থের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। একজন ভালো বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবে যদি শ্রমিক ইউনিয়নগুলি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয় এবং মালিকগণও এই নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলেই সুফল পাওয়া সম্ভব (দৈনিক ইত্তেফাক : ২১ জুন, ১৯৬৯)। শ্রমিক নেতা ও মালিক উভয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি ১৯৬৯ সালের ৫ জুলাই নতুন করে আইনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৯ সালের ৬ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে প্রস্তাবিত শ্রমিক–মালিক সম্পর্ক আইনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) শ্রমিক ও মালিকদের সমিতি গঠনের অবাধ অধিকার।

(২) দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ধর্মঘট ও লক আউট ঘোষণার অধিকার পুন: প্রতিষ্ঠা।

(৩) আপোষ বোর্ড ও স্বেচ্ছামূলক সালিশ প্রথা প্রবর্তন।

(৪) শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

(৫) যৌথ দর কষাকষিকারী এজেন্ট হিসাবে ইউনিয়নগুলোকে নির্বাচিত করতে হবে এবং তাদের (ক) দাবি-দাওয়া উত্থাপনের (খ) দ্বিপক্ষীয় যৌথ দর কষাকষির (গ) ধর্মঘট আহ্বানের এবং (ঘ) শ্রমিক পরিষদগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের পূর্ণ অধিকার থাকবে। এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়নগুলোর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কোনো পূর্ব শর্ত থাকবে না। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যৌথভাবে দর কষাকাষি ও অর্থপূর্ণ আলোচনা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৬) যৌথ দর কষাকষিকারী এজেন্ট বলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের জন্য চেক অব প্রথা প্রবর্তন।

(৭) দিন মজুর শব্দের সংজ্ঞার ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন।

(৮) অত্যাবশ্যক ও জনকল্যাণ বিভাগের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা ন্যূনতাম পর্যায়ে কমিয়ে আনা।

(৯) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রেশনকালে ও বিরোধাদি অমীমাংসিত থাকার সময় তাদের কর্মকর্তাদেরকে সম্ভাব্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে সংরক্ষণ দান।

(১০) শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের রেজিস্ট্রেশন, মধ্যস্থতা, আপোষ, পরিদর্শন, শ্রমিক আইনসমূহ প্রয়োগ এবং তার পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রশাসন ব্যবস্থা জোরদার করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে তিনটি জেলাও স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা (দৈনিক ইত্তেফাক : ৬ জুলাই, ১৯৬৯)।

এছাড়া এ নতুন শ্রমনীতিতে শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক ১১৫ টাকা হতে ১৪০ টাকা এবং পুর্ব পাকিস্তানের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হতে ১২০ টাকা ধার্য করা হয়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ডেমরাসহ ঢাকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় আহমদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিল। মিল কর্তৃপক্ষ এসময় প্রায় ৯০০ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেয়। ৭ মে সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রম আইন সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব কামরুল হাসান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "প্রকৃতপক্ষে শ্রম আইনগুলোর অধিকাংশ শর্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি এবং এ কারণে শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে (Ahmad, 1969 : 107)|" ১৫ মে করাচিতে পাকিস্তান সরকার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই শ্রম সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে 'অল পাকিস্তান লেবার কনফারেন্স' আয়োজন করেন, যেটি ১৭ মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এ সম্মেলনে। ১৯৬৯ সালের ২০ মে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে, সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না বা তাদের সেবা বন্ধ করা যাবে না। ১৯৬৯ সালের ১৩ নভেম্বর বোর্ডের বিবৃতির উপর ভিত্তি করে চূড়ান্তভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্স'। কিন্তু কিছুদিন পরেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এটিও কার্যকরী হয়নি।

আইনসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবতা

পাকিস্তান আমলে শ্রমিকদের কার্যক্রম ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার বহুসংখ্যক আইন প্রণয়ন করে। বিভিন্ন পেশায় ও শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণসাধনই উক্ত আইনের লক্ষ্য হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবতা ছিলো ভিন্ন। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে যে সকল শ্রম আইন প্রণীত হয়েছিল সেগুলো শুধু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি ও আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সেগুলি কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়। ফলে সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাগুলিতে কার্যরত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কস চার্জডের[৪] অজুহাতে হাজার হাজার শ্রমিককে বছরের পর বছর অস্থায়ীভাবে রাখা, কয়েক মাস পর পর নাম কেটে দিয়ে নতুন লোক ভর্তি করা এবং ছাঁটাই করে পুনর্বহাল করার সময় কোনো কোনো ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের ফলে মূল সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে স্বভাবতই উৎপাদন তথা মুনাফা হ্রাসের চিন্তায় তা মালিকপক্ষের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে এরূপ অসন্তোষের সময় কর্তৃপক্ষের প্রায়ই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায় (পূর্বদেশ : ১ নভেম্বর, ১৯৬৯)। কেননা সেখানে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত নেই। উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্তাদের বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের বক্তৃতায় পরিস্কার হয় যে প্রাথমিকভাবে সরকার অর্থনৈতিক নীতিমালায় দ্রুত উন্নয়নের দিকে মনোযোগী ছিল। এ কারণে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করে এবং হরতালে নিরুৎসাহিতকরণসহ যে সকল কর্মকাণ্ড উৎপাদনে বাধাঁর সৃষ্টি করে তা বন্ধের নির্দেশ দেয়। সরকারের বক্তব্য হলো– শ্রমিক, কর্মচারী এবং সরকারের স্বার্থ অভিন্ন। তাই এর একটির ক্ষতিগ্রস্ত করলে অন্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সকলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের নীতি গৃহিত হয়। তবে নীতিসমূহ শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষামূলক আইন প্রণয়নের চেয়ে হরতাল বন্ধে বেশি সক্রিয় ছিল (Nikki R. Keddie, 1957 : 575-586)। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) সনদের স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠী আই.এল.ও সনদের বিধিবিধান প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করে এবং শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকারসহ যৌথ দর কষাকষির অধিকার হরণ করে। এর ফলে শ্রমিক-কর্মচারীগণ মালিকপক্ষ কর্তৃক শোষণের শিকার হয় (পূর্বদেশ : ৩ মে, ১৯৭০)। মূলত এসময় শ্রম সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শ্রম

দফতরের হাত থেকে পুলিশ বিভাগের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছিল বলা চলে। ফলে শ্রমিকদের অসংখ্য অমীমাংসিত সমস্যা কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। মোনেম খানের প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৬৫ সালে যে কালাকানুন পাশ করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মেহনতী শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ করা হয়, তার ফলে শ্রমিক শ্রেণির রুদ্ধ অসন্তোষ এ সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে ফেটে পড়ে (পূর্বদেশ : ১ নভেম্বর, ১৯৬৯)।

১৯৫৯ সালের 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অর্ডিন্যান্স' নামে এক আদেশনামার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক সমাজের মৌলিক অধিকার তথা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। এ আদেশনামার সামান্য কিছু সংশোধনসহ ১৯৬৫ সালের ৩ আগস্ট 'দ্য ইস্ট পাকিস্তান লেবার ডিসপিউটস অ্যাক্ট', ১৯৬৫ নামে আইন প্রণীত হয়। এর মাত্র পাঁচদিন পর ১৯২৬ সালের 'দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট' এর গণতান্ত্রিক ধারাগুলিকে বাদ দিয়ে প্রণয়ন করা হয় 'দ্য ইস্ট পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট', ১৯৬৫ (আজাদ, ২০১৯ : ২২১)। এ আইনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলা হয় এবং তা পরিপূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও মালিকপক্ষের অনুমোদনের অধীন করে ফেলা হয়। আর রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া আর কারো ন্যূনতম কোন বিষয়েও কথা বলার অধিকারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সংসদের ১৯৬৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসের অধিবেশনে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করার জন্য অনেকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়। এসব আইনে শ্রমিক অসন্তোষকে এমনভাবে মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যে, সরকারি কিছু আমলা এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি লেবার কোর্টের ওপর তাদেরকে শায়েস্তা করার চূড়ান্ত অধিকার দেওয়া হয়। আমলাদের নিয়ে গড়ে তোলা এ আদালতকে শুধু রায় প্রদানের অধিকারই প্রদান করা হয় না, রায়ের বিরুদ্ধে কেউ আপিল করতে চাইলে তা করতে পারবে কি পারবে না তারও দায়-দায়িত্ব প্রদান করা হয় (East Pakistan Government Press, Dacca, 1960: 4-5)। এর পূর্বে শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় যন্ত্রচালক, গাড়ি চালক, ফোরম্যান, রাজমিস্ত্রিসহ মোট ৫০ রকম কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও ধর্মঘট করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় (Shafi, 1969 : 329)। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন, সড়ক পরিবহন, গণযোগাযোগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথক পৃথক আইন ও অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যেসকল আইন নিপিড়নমূলক ছিলো। ১৯৫৭ সালের 'দ্য কমিউনিকেশন এন্ড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস মেইনটেন্যান্স অর্ডিন্যান্স'-এ বলা হয়-যোগাযোগ ও পরিবহন কর্মে নিয়োজিত যে কোন চাকরিজীবীর জন্যই ধর্মঘট নিষিদ্ধ এবং এ চাকরিতে কর্মরত কোন ব্যক্তি যদি ধর্মঘটের ডাক দেয় বা ধর্মঘট শুরু করে তাহলে তার নিয়োগদান এ নির্দেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা পরে যখনই হোক না কেন তা অবৈধ বলে ঘোষিত হবে (আজাদ, ২০১৯ : ২২২)। অধ্যাদেশের ৪ নং ধারায় বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি যে কোন ধরনের ধর্মঘটে যোগদান করে তাহলে সে কারাদন্ড বা অর্থদন্ড কিংবা উভয় ধরনের শাস্তির যোগ্য অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। কারাদন্ডের মেয়াদ হবে ৬ মাস এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ হবে ২০০ টাকা। এ অধ্যাদেশের ৫ নং ধারায় বলা হয় যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের কোন ধর্মঘটে যোগদানের জন্য কাউকে অনুপ্রাণিত করে কিংবা ধর্মঘট সংগঠনে ভূমিকা পালন করে তাহলে তার শাস্তির মেয়াদ হবে ১ বছরের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা কারাদন্ড ও জরিমানা উভয়টিই। এ অধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় সবচেয়ে কঠিনতর নির্যাতনমূলক আইনটি সংযোজিত হয়। এই ধারার মাধ্যমে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার অধিকার পেয়ে যায় (আজাদ, ২০১৯ : ২২২)।

পাকিস্তান সরকারের বিশেষ দু'টি শ্রমনীতি- ১৯৫৫ সালের শ্রমনীতি এবং ১৯৬৯ সালের শ্রমনীতির মধ্য দিয়ে ধারণা হয় যে, পাকিস্তান সরকার আই. এল. ও কনভেনশনের মূলনীতি অনুযায়ী

শ্রমিকের অধিকারসমূহ রক্ষা করবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, এসময় ট্রেড ইউনিয়য়নগুলোর স্বাভাবিক কর্মসূচি পালন, এমন কি তাদের অফিসসমূহ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমর্থন পুষ্ট 'ইস্ট পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন' এবং তাদের সহযোগী 'ইস্ট পাকিস্তান নাবিক ইউনিয়ন তাদের অন্য ৬০টি ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বন্ধ করে এবং এসময় সিলেটের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। এসময় সরকার সামরিক আইনের অধীনে জেলার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেয়। এই ভিত্তিতে সিলেট জেলার চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস বন্ধ করে এবং সিলগালা করে দেয়। এমনকি এর সকল নথিপত্র এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আই এল ও কনভেশনের ৮৭ নং অনুচ্ছেদের 'সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সংগঠিত করার অধিকার রক্ষা, সংক্রান্ত ধারাটি স্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়। ফলে পাকিস্তানিদের এই নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে (Umar, 2006 : 38-39)।

১৯৬৮-৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয় ভূমিকা মূলত এই নিপীড়ন ও বঞ্চনারই ফল। ইয়াহিয়া সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ও যৌথ দর কষাকষির যতটা সুযোগ নতুন শ্রমনীতিতে দিয়েছিলেন আইনের ফাঁকফোকরে মালিকগোষ্ঠী সেটি অনেকাংশেই খর্ব করেছে। তদুপরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় মজুরী বৃদ্ধিতে তেমন কোনো সুবিধা হয়নি শ্রমিকদের। ফলে শ্রমক্ষেত্রে উত্তেজনার অবসান সম্ভব হয়নি (পূর্বদেশ : ৩ মে, ১৯৭০)।

নারী ও শিশু শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নে আইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। নারী শ্রমিকরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হত। একই পরিমাণ কাজ করে পুরুষের তুলনায় মজুরিই শুধু কম পেত না অনেক সামাজিক সংকটের মোকাবেলা করে কাজ করতে হতো। নারীরা মানসিকভাবে খুব চাপে থাকত কারণ শুধু নারী হওয়ার জন্য যে কোনো সময় তার পরিবার বা কারখানা কাজ বন্ধ করে দিতে পারে (Mahmood, 1957 : 146)। আই.এল.ও. মিশন এবং জরিপে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক শিল্পকারখানা নারী মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনের শর্তগুলো নারীদের প্রদান করতে পেরেছে এবং অনেক শিল্পকারখানা নারীরা গর্ভবর্তী হলে ছাঁটাই করেছে (Nikki R. Keddie, 1957 : 575-589)। শিশুদেরকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ দেওয়া হত বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলোতে যেগুলোর পরিবেশ ছিলো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। যদিও শিশু শ্রম আইনে শিশু শ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স ১২ করা হলেও এটি বাস্তবায়িত হয়নি। শিশু শ্রম সস্তা ছিল বলেই বেশি বেশি শিশু শ্রমিক নিয়োগ করত। এর ফলে শুধু শিশুদের স্বাস্থ্যই নষ্ট হতো না অনেক প্রাপ্তবয়স্ক (যুবক) চাকুরী থেকে বঞ্চিত হতো (Nikki R. Keddie, 1957 : 579)। ফলে এসব শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও শ্রমিকরা আন্দোলন করে এবং এসব আইন প্রত্যাহারের দাবি জানায়। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ তাদের প্রথম অধিবেশনে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন প্রত্যাহারের দাবি জানায় (দৈনিক আজাদ: ১৮ মে, ১৯৬৬)। সেখানে বলা হয়-

> এই প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনে গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিক শ্রেণীর উপর অহেতুক বরখাস্ত মামলা মোকাদ্দমা; গুন্ডার হামলা, পুলিশী নির্যাতন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার হয়রানির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তৎসহ সরকারে মালিক ভজা শ্রমনীতি এক নিদারুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এই পরিস্থিতির আশু প্রতিকার দাবী করিতেছে। এই সম্মেলন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এক ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

এই অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৬৫ সালে জারিকৃত ৬টি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন জারির প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের ও সত্যিকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের

মতামত নিয়ে শ্রমিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুনভাবে সমস্ত শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি জানায়। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, দেশের শ্রমিক শ্রেণি যে কোনো মূল্যে এই সব কালাকানুন বাতিল সাধন করবে এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এইসব কালাকানুন প্রতিরোধের জন্য ১৯৬৫ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিকে' এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। এছাড়া এই সম্মেলনে বলা হয়- সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে প্রদেশের অন্যতম বৃহৎ সুতাকল ১নং ও ২নং ঢাকেশ্বরী কটন মিল এবং আদর্শ কটন মিল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। এসকল মিলে মোট ছয় হাজারেরও বেশি শ্রমিক চাকুরী করতেন। তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে প্রায় ৬০ হাজার লোকের ভরণ-পোষণ চলত। দীর্ঘদিন ধরে এ সকল মিল বন্ধ থাকায় মিলে চাকুরীরত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রায় অনাহারে দিন যাপন করছে। ফলে মিলগুলো অবিলম্বে চালু করার আহ্বান জানায় (দৈনিক আজাদ : ১৮ মে, ১৯৬৬)।

এছাড়া ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনেন ১ম বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো -

- ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রম আইনে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের পরিপন্থী 'শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক অধিকার অর্থাৎ ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সম্মেলন এই শ্রম আইনের প্রত্যাহার দাবি করে এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পুনরায় আইন প্রণয়নের দাবি জানায়।

- ১৯৬৪ সালের ২য় চটকল ধর্মঘট কালে খুলনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দাবী করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার দাবি করে এবং মেনে না নিলে চটকল শ্রমিকগণ সমগ্র প্রদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলবে।

- ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বায়ত্ত্বশাসন দাবী করা হয়। বলা হয় শ্রমিক শ্রেণি পাকিস্তানের বৃহত্তর জনতার অংশ। দেশের মানুষের সমষ্টিগত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শ্রমিকদের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। এই দেশ হতে অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহারের দাবী জানায়। করিম জুট মিলের পরোক্ষভাবে মালিকপক্ষের গুন্ডামির তীব্র নিন্দা জানিয়ে সতর্ক করে দেয় যে, দালাল নেতাদের অনুমোদন দান করে শ্রমিক আন্দোলন বানচাল করার অপচেষ্টা সহ্য করা হবে না। প্রয়োজন হলে চটকল শ্রমিকরা অনুমোদন ব্যতীতই প্রত্যেকটি কলে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই প্রদেশে ইতিপূর্বে পুলিশের গুলিতে নিহত আদমজি শ্রমিকের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

- শ্রমিক নেতা সুধীর সেনসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে বিনা বিচারে আটক শ্রমিক নেতা, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তিদানের আবেদন করা হয়।

- শ্রম বিরোধ যে কোনো আদালতেই হোক ৬ মাসের মধ্যে এর ফয়সালা করার দাবি করা হয়। বলা হয় যে, দীর্ঘদিন মামলা মোকাদ্দমা করে টিকে থাকা শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আদালতের কাজ সহজীকরণ করতে হবে। (দৈনিক আজাদ : ২৫ মার্চ, ১৯৬৬)

শ্রমিকদের বেতন কিছুটা বৃদ্ধি করলেও দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে খুব একটা লাভ হয় না শ্রমিকদের। তাই স্বল্প মূল্যে রেশন প্রথা চালু এবং বিশেষ ভাতা প্রদানের দাবিও জানানো হয় এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত শ্রম প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার আবেদন জানানো হয়।

নিখিল পাকিস্তান কনফেডারেশন অব লেবারের সহ সভাপতি ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ.এস.এম সোলায়মান সরকারের নয়া শ্রমনীতিকে স্বাগত জানান। তার ভাষ্যমতে

বিগত সরকারের আমলে শ্রমনীতি শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল এবং শ্রমনীতি সর্বদাই শ্রমিকদের স্বার্থ হানি ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত হত। বর্তমান শ্রমনীতিকে বিগত কালের শ্রমনীতির চেয়ে অনেক প্রগতিশীল এবং এই নীতি সততার সাথে কার্যকরী করা হলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে বাধ্য।

এছাড়া ১৯৬৯ সালের ৭ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের কার্যকারিতার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, দুর্গত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত শ্রম আইনের অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং অধিকাংশ শর্তই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক পূরণ করা হয়নি। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় গৃহীত শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কল্যাণ তহবিল, কোনো শ্রমিক আহত বা নিহত হলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত আইনসমূহকে 'বিভ্রান্তিমূলক' বলে অভিহিত করেন। কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে যে, সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে করুণ। শ্রমিকদের মজুরী, উপযুক্ত ভাতা ও অন্যান্য পেশাগত সুযোগ-সুবিধা দানের উপরও কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৫ মে করাচীতে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক ও সরকারপক্ষের ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে শ্রমিকদের অবস্থা ও তাদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী ধার্যের বিষয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যালোচিত হয়। তবে সর্বনিম্ন মজুরী বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবের সাথে মালিকপক্ষ মতৈক্যে পৌছাতে পারে নি। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয় যথাক্রমে মাসিক ২৬০ টাকা ও ২২০ টাকা (দৈনিক ইত্তেফাক : ১৮ জুন, ১৯৬৯)। কিন্তু মালিকপক্ষ নিজেদের এই মজুরী প্রদানের ক্ষমতার বিষয়টি পর্যালোচনা করে উল্লিখিত হারে সর্বনিম্ন মজুরী ধার্যের বিরোধিতা করেন।

প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের বিশেষ করে অদক্ষ শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী ধার্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত অদক্ষ শ্রমিকরা দিন প্রতি দুই টাকা থেকে তিন টাকা মজুরী পেয়ে থাকে। মাসিক ষাট বা আশি-নব্বই টাকায় একজন শ্রমিক পরিবার-পরিজন নিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জীবন-যাপন করতে পারে না। সাধারণত এই অবস্থায় পড়েই শ্রমিকরা ওভার-টাইম খাটেন, সাধ্যের অতিরিক্ত ওজন মাথায় বহন করে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে টেক্সটাইল, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান শতকরা ৩০০% থেকে ৪০০% মুনাফা অর্জন করে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সাধারণের দৈনিক মজুরী ধার্যের হার নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রতীয়মান হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী বিষয়ে মালিক পক্ষের মজুরী প্রদান ক্ষমতা বিবেচনা করার অপেক্ষা রাখে না। তাই জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৬৯ সালের ন্যূনতম মজুরী বাস্তবায়ন যুক্তিযুক্ত। শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্য মূল্য ও পেশাগত সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়টি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো মহলের চক্রান্তে যাতে ভন্ডুল না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন (দৈনিক ইত্তেফাক : ১৮ জুন, ১৯৬৯)।

সমগ্র পাকিস্তান আমল জুড়ে শ্রমিকরা এসকল ক্রুটিপূর্ণ আইন এবং কতিপয় শ্রমিকস্বার্থ সহায়ক আইনের অপপ্রয়োগের কারণে অসংখ্য বিরোধ তথা ধর্মঘটে অংশ নেয়। ১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তিন মাসেই (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর) পূর্ব বাংলায় ১৭ টি ধর্মঘটের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৩টি অক্টোবর মাসে, ৭টি নভেম্বর মাসে এবং ৭টি ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। ১৭ টি ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৯,২৪৮ জন এবং শ্রম দিবসের ক্ষতি হয় ১,৭৯,৪৯১দিন। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের কিছু পাটকলে সংঘটিত ধর্মঘটে শ্রম দিবসের ক্ষতি হয় ১,০৫,০০০ দিন (East Pakistan Labour Journal : Vol. IX, No. IV, 1956, P-287)।

উপরিউক্ত ১৭ টি বিরোধের মধ্যে ১ টি সংগঠিত হয় কটনমিলে ৯টি পাটকলে, ৩টি ওয়াটার ট্রান্সপোর্টে, ২ টি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আর বাকিগুলো বিবিধ শিল্পে। এর মধ্যে ১৩ টি বিরোধ সংঘটিত

হয়েছিলো মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, ২টি পারসোন্যাল (Personnel) সংক্রান্ত কারণে, ১টি ছাঁটাই করার কারণে এবং ১টি বিবিধ ইস্যু নিয়ে। এর মধ্যে ১১টি বিরোধের মীমাংসা হয়েছে শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে, ৪টি তাদের স্বার্থের বিপক্ষে এবং বাকি ২টির মীমাংসা স্থগিত ছিল। এর মধ্যে ৫টি সরাসরি শ্রমিক এবং মালিকের সরাসরি সমঝোতায় সমাধান হয়, ১০টি সরকারি সমঝোতা অফিসারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় এবং একটির ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কোনো শর্ত ছাড়াই কাজে ফিরে আসে এবং বাকি ১ টি ট্রাইবুন্যালে বিচারাধীন ছিলো (East Pakistan Labour Journal : Vol. IX, No. IV, 1956, P-287)। এছাড়া পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন কারণে সংঘটিত শ্রমিক বিরোধের চিত্র নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

সারণি-১
পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন কারণে সংঘটিত শ্রমিক বিরোধ

	অক্টোবর, ১৯৫৬		নভেম্বর, ১৯৫৬		ডিসেম্বর, ১৯৫৬		মোট	
কারণসমূহ	ধর্মঘটের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংখ্যা	ধর্মঘটের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংখ্যা	ধর্মঘটের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংখ্যা	ধর্মঘটের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংখ্যা
মজুরি	২	২১৬	৩	৮,৭৫৪	৮	৩১,৯২০	১৩	২২,৮৯০
বোনাস	-	-	-	-	-	-	-	-
ছাঁটাই ও কর্মঘন্টা	১	৬৪৮	-	-	-	-	১	৬৪৮
পারসোন্যাল (Personnel)	-	-	-	-	২	৫,৫৬৮	২	৫,৫৬৮
রেশন	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	১	১৭৫	১	১৭৫
মোট	৩	৮৬৪	৩	৮৭৫৪	১১	৩৭,৬৬৩	১৭	২৯,২৮১

সূত্র: East Pakistan Labour Journal,Vol.IX,No.IV,1956, P-291

লক্ষ্য করা প্রয়োজন শ্রমক্ষেত্রে উৎপাদনের অনবদ্য হাতিয়ার হলো শ্রমিক শ্রেণি। একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে শ্রমিক শ্রেণি অসামান্য ভূমিকা পালন করে। তবুও এ শ্রেণি যুগে যুগে নিগৃহীত হয়েছে, শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই বঞ্চনার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিশ্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব শুরু হলে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের দিয়ে অবৈধভাবে কাজ করিয়ে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মালিকরা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে নিম্ন মজুরি, অত্যধিক কর্মঘন্টা, ইচ্ছামত শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় শোষণ করতে থাকে। যা এক পর্যায়ে শ্রমিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায়ও শ্রমিক শোষণ একই প্রক্রিয়ায় হয়েছিল। তাই পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধি, মহার্ঘভাতা, ওভারটাইম এবং বোনাস প্রভৃতি দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২৫ ডিসেম্বর পূর্ববাংলার পাট শ্রমিকরা যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সেখানে চিত্তরঞ্জন, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ঢাকেশ্বরী সুতি বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা তাদেরকে সমর্থন জানিয়ে ধর্মঘট করে তাদের অসন্তোষের বাহি:প্রকাশ ঘটায়। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে নারায়ণগঞ্জে বস্ত্র কারখানায় এগারো জন শ্রমিক ছাঁটাই করে মালিকপক্ষ। এর বিরুদ্ধে কলকারখানার শ্রমিকরা ষোল ঘন্টা ধর্মঘট করে। ১৯৬২ সালের ২৬ জুলাই খুলনার ভবানী বস্ত্রশিল্প কারখানায় ৫৫০ জন শ্রমিক কর্তৃপক্ষের কাছে ১০ দফা দাবি জানায় এবং ১০ আগষ্ট থেকে

অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেয়। এ ১০ দফার মধ্যে ছিল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুর্নবহাল করা, নিম্ন মজুরি নির্দিষ্ট করা, মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি। ১৯৬৩ সালে টঙ্গীর বস্ত্র শিল্প শ্রমিকরা ৪০ দিন ব্যাপী ধর্মঘট করে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। সরকার এই শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিলে সুন্দর আলী নামে এক শ্রমিক নিহত হন। ফলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে টঙ্গীর বস্ত্র শ্রমিকরা দুই মাসব্যাপী ধর্মঘট করে। ষাটের দশকে নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কীভাবে ধীরে ধীরে ধর্মঘটের সংখ্যা, ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা, শ্রম দিবসের ক্ষতি বৃদ্ধি পায় তা একটি সারণির মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

সারণি-২
শ্রমিক ধর্মঘট: ১৯৬০-১৯৬৯

সন	ধর্মঘট	অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রম দিবসের ক্ষতি
১৯৬০	১২	৬,০৮৮	১৭,৯৪৭
১৯৬১	১০	৪,৪৬৪	৫,৪৮৬
১৯৬২	৩১	১৬,৯৪৯	৮৫,২৪৮
১৯৬৩	৫৪	১,০২,১৯৮	৯,৩৮,০৯৩
১৯৬৪	৭২	১,৫৮,৬১৪	৩৭,৮৭,৩৫৭
১৯৬৫	৫৫	৬৩,৭০৭	২,৩৬,৮০৫
১৯৬৬	৬০	৭৮,২৭৮	২,৪১,১০০
১৯৬৭	৪৮	৬৬,৩৯১	৬,০৫,২২২
১৯৬৮	৩০	৫৬,৩০৯	১,৫৪,৪৮০
১৯৬৯	৫৫	১,১৩,১৯৪	৫,৬১,৮৭৪

সূত্র : East Pakistan Labour Journal, Vol. IX, No. IV, 1956, P-287

সুতরাং বলা যায় যে, ষাটের দশকে শিল্পকারখানাগুলোতে শ্রমিক আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা, দাবি-দাওয়া সমূহের অবাস্তবায়ন, শিল্প বিরোধে সরকার কর্তৃক মালিক শ্রেণিকে পুলিশি সহায়তা প্রদান ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। শ্রমিকদের এই অসন্তোষ ধর্মঘট-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শ্রমিকদের ধর্মঘট-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ এবং সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এবং শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। শ্রমিক শ্রেণি যে শুধু তাদের দাবি-দাওয়া অর্জনের জন্যই আন্দোলন করেছে তা নয়, ষাটের দশকের সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষ্যণীয়। ১৯৬২ সালে ছাত্ররা প্রথম সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করলে টঙ্গীর শ্রমিকরা তাদের সাথে একত্মতা ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি আদায়ের হরতালে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তেঁজগাওয়ের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের এই অবদানের কারণেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা যে ১৪দফা দিয়েছিল তাতে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াও সংযুক্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিকরাই ছিলো অগ্রগামী । তারাই প্রথম ঘেরাও আন্দোলন শুরু করে। সে সময়ের সংবাদপত্রগুলোতে এই তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালের ১৩ মার্চ দৈনিক আজাদ পত্রিকার একটি খবরে উল্লেখ করা হয়-

> টঙ্গীর শ্রমিকগণ গতকাল বুধবার চারটি টেক্সটাইল মিল ও একটি রবার ফ্যাক্টরীতে ঘেরাও অভিযান চালায়। শত শত শ্রমিক প্রায় তিনঘন্টা যাবৎ মিল ও ফ্যাক্টরী ঘেরাও করিয়া রাখার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৯ জন বরখাস্তকৃত শ্রমিককে কাজে পুনর্বহালের দাবী মানিয়া লন। ঘেরাও আন্দোলন করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অলিম্পিয়া, মনু, কাদেরিয়া ও মেঘনা টেক্সটাইল মিল এবং আজাদ রবার ফ্যাক্টরীর মোট ৯ জন বরখাস্তকৃত শ্রমিককে চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং তাহাদের সাড়ে তিন মাসের বকেয়া প্রদানের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। (দৈনিক আজাদ : ১৩ মার্চ, ১৯৬৯)

আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯৬৯ সালের 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্স' এবং সামরিক আইনে গৃহীত ধর্মঘট বা লক আউট নিষিদ্ধ করার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক আইন আদালতে পূর্বের যে মামলাগুলো বিচারাধীন ছিল সেগুলো সমস্ত বাদ দেওয়া হয় এবং ধর্মঘট ও ঘেরাওয়ের জন্য যারা শাস্তি পেয়েছিলেন তাদের অনেককে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদিও ১৯৬৯ সালে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হলে সামরিক সরকার শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করতে এই আইন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শ্রমিকরা তখন প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং অবাঙালি কারখানার মালিক এবং অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর।

উপসংহার

১৯৪৭ সালের পর সদ্য স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নানাবিধ আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন করতে থাকে। শ্রম আইনের ক্ষেত্রেও বৃটিশ আমলে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছিলো সেগুলোই গ্রহণ করে। তবে পাকিস্তান সরকার প্রয়োজনে এসব আইন সংশোধন করে বারবার। এসব আইনের অধিকাংশই ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। কিছু আইনে শ্রমিকগণকে সীমিত অধিকার দেয়া হয়েছিল যেগুলো কাজে লাগিয়ে শ্রমিকসমাজ তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারতো কিন্তু প্রকৃতঅর্থে নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি। সরকার সর্বদা মালিকশ্রেণির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। উপরন্তু বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আইন আরোপ করে সর্বদা শ্রমিকদের অধিকার ও ক্ষমতাকে হরণ ও কুক্ষীগত করার চক্রান্ত করেছে। ফলে সরকার-মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আই.এল.ও. মিশন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আই.এল.ও. কনভেনশনের শর্তসমূহ প্রয়োগে কঠোরতা আরোপ করেন যাতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু আই.এল.ও মিশনও উল্লেখ করে যে, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিষ্পেষণের শিকার হয় এবং এই কার্যক্রমে অংশ নিলে বিচার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয় (Report of the ILO, 1954 : 51)। ফলে যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াসমূহের সুরাহা না হলে, মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গ হলে, নিম্ন মজুরী, কাজের অনুকূল পরিবেশের অভাব, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অত্যধিক কর্মঘন্টা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব তথা শ্রমিক বরখাস্ত, ছাঁটাই ও পদাবনতি ইত্যাদির কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে এবং এসকল আইনের ত্রুটি ও অপপ্রয়োগের কারণে পাকিস্তান সরকার ও মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে অসংখ্য বিরোধ তথা ধর্মঘটে অংশ নেয়। এই ধর্মঘট ও আন্দোলনে প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলো নেতৃত্ব দিয়ে জোরদার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে এবং ষাটের দশকের শেষে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে আওয়ামীলীগও 'শ্রমিক লীগ' গঠন করে শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বার্থ এবং শ্রমিকদের স্বার্থ একীভূত হওয়ায় তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। আই.এল.ও. তার সদস্য দেশসমূহের সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সংগঠন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মনব জাতির কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রমনীতি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র যাতে এ নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়ে ব্যাপক কর্মপ্রণালী প্রস্তুত করা। সংস্থাটির সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ১৮৯ টি কনভেনশন গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সরকার। পাকিস্তান সরকার এর মধ্যে ২৩টি কনভেনশন অনুমোদন করেছিল। সূত্র: খান, ড. মোহাম্মদ আলী (২০১৩), শ্রমকল্যাণ, *শিল্পসম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (৩য় সংস্করণ), পৃ-৩১৫-৩১৭।

২. 'দ্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-১৮৬০ এর ১২০ নং ধারাতে বলা হয়- যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো অবৈধ কাজে অথবা অবৈধ নয় এমন কোনো কাজকে অবৈধ উপায়ে সম্পাদন করতে বা করাতে সম্মত হয় তাহলে তা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে। আর এই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দুই বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হবে। সূত্র: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf (accessed: 12.02.2023)

৩. আই.এল.ও.কনভেনশনের পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৮৭ নং কনভেনশনটি হলো- 'সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ' এবং ৯৮ নং কনভেনশনটি হলো 'সংগঠন করার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার'। সূত্র: Ahmad, Kamruddin (1969), *Labour Movement in East Pakistan, Progoti Publishers*, Dhaka.

৪. ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারী বা শ্রমিক হল একজন অস্থায়ী কর্মচারী যাকে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে চুক্তির ভিত্তিতে সীমিত সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়। তারা স্থায়ী কর্মচারীদের মতো চাকুরীর নিরাপত্তা, পেনশন প্রভৃতি সুবিধার অধিকারী নয়। সূত্র:
https://indiankanoon.org/search/?formInput=who%20is%20workcharge%20employee (accessed: 15.02.2023)

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১৮ মে, ১৯৬৬।

দৈনিক আজাদ, ১৩ মার্চ, ১৯৬৯।

দৈনিক আজাদ, ২৫ মার্চ, ১৯৬৬।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুন, ১৯৬৯।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জুন, ১৯৬৯।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জুলাই, ১৯৬৯।

দৈনিক পূর্বদেশ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

দৈনিক পূর্বদেশ, ১ নভেম্বর, ১৯৬৯।

দৈনিক পূর্বদেশ, ৩ মে, ১৯৭০।

দলিলপত্র ও রিপোর্ট

Annual Report on the Working of the Trade Unions Act,1926 in East Pakistan, Commerce, Labour and Industries Department, Government of East Pakistan Press, Dacca,1960.

East Pakistan Labour Journal, Vol. IX, No. IV, 1956 .

Report of the ILO, *Labour Survey Mission (Summary of Recomendations) Pakistan Trade*, V (April, 1954).

The East Pakistan Industrial Disputes Rules,1960, Commerce, Labour and Industries Department, East Pakistan Government Press, Dacca, 1960.

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, লেলিন (২০১৯), *উণসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

খান, ড. মোহাম্মদ আলী (২০১৩), শ্রমকল্যাণ, *শিল্পসম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (৩য় সংস্করণ)।

ধর, নির্মলেন্দু (২০১৭),*বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্পআইন*, রেমিসি পাবলিশার্স (৪র্থ সংস্করণ), ঢাকা।

হোসেন, আমজাদ (২০০২),*বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, পড়ুয়া, ঢাকা।

Ahmad, Kamruddin (1969), *Labour Movement in East Pakistan, Progoti Publishers*, Dhaka.

Akhtar, S.M. (1951), *Economics of Pakistan*, Lahore.

Chandra, Bipan (2009) , *History of Modern India*, Orient Blackswan Private Limited, New Delhi.

Khan, T.I.M. Nurunnabi (edi) (1996) (2nd Revised), *Labour administration profile on Bangladesh*, International Labour Organisation Area Office, Dhaka.

Mahmood, Mrs. Ayesha (1957), *Special problems of women and children Employees' Welfare*.

Shafi, Mohammad (1969) , *East Pakistan Labour code*, Bueau of Labour Publications.

Shaheed, Zafar (2007) , *The labour movement in Pakistan*, Oxford University Press.

Umar, Badruddin (2006), *The Emergence of Bangladesh: Rise of Bengali Nationalism (1958-1971), Vol 2*, Oxfod University Press, New York.

ওয়েবসাইট নির্দেশিকা

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Labour_Law (accessed: 01.10. 2022)

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/labor-law (accessed: 03.10 2022)

Nikki R. Keddie (1957), *Labor Problems of Pakistan*, The Journal of Asian Studies, Vol. 16, No.4 (Aug-1957). (accessed: 03. 10. 2022)

Yushuhong & Malik Zia-ud-din, *Analyzing the Labour Issues in Pakistan: A Historical Background of Labour Laws and Labour Unions*, Article, https://www.researchgate.net/publication/321874146. (accessed: 03.10. 2022)

[**Abstract :** Labor laws are introduced to protect the mutual relationship of employer-employee in the labor field and fair rights of the working people. But in the most cases workers are deprived of their rights. The labor laws which were introduced in East Bengal during the period of 1947-1971 such as 'The Trade Union Act', 'The Trade Disputes Act', 'The Maternity Benefit Act', 'The Workmen's Compensation Act', and 'The Payment of Wages Act' were not properly applied in industries. As a result, the working class suffered much. During the Pakistan era, the problems of low allowances, overtime, retrenchment of workers, poor working environment and bonus were not resolved. As a result, intense dissatisfaction was observed among the workers at that time and numerous labor movements were took place. In this present article, an attempt has been taken to find out the reason of the owner-labor relations deteriorated during the period of 1947-1971 despite of the presence of labor laws in East Bengal and how the labor movement became associated with the liberation struggle of Bangladesh.]